সেবা দানের প্রেক্ষাপটে পুলিশের ‘পেইন পয়েন্ট’ কোথায়?

মোঃ শাহ আলম, বিপিএম
আইওএম কনসালট্যান্ট | সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি|
ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্ট|
https://www.linkedin.com/in/md-shah-alam-86b162337

গত ৪ নভেম্বর ২০২৫—মাত্র ৩৪ বছর বয়সে আফ্রো–এশিয়ান–আমেরিকান অভিবাসী জোহরান মামদানি নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে সাবেক গভর্নর ও অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের পরাজিত করে একাধিক রেকর্ড গড়েছেন, আবার কিছু রেকর্ড ভেঙেও দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে—তার সাফল্যের রহস্য কী?

মুখ্য সংবাদমাধ্যমগুলোর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, জোহরান মামদানি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে নিউইয়র্কবাসীর **pain points**, অর্থাৎ নাগরিক জীবনের প্রকৃত কষ্টের জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু আজ আমরা সে গল্প বলব না। আমরা বলব **বাংলাদেশ পুলিশ** নিয়ে—সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে আলোচিত, জনগণের প্রত্যাশা ও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে। আগস্ট বিপ্লবে যে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা পুলিশের ৪০০-এরও বেশি থানা-ফাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে; তারাই আগুনের ছাই উড়ে যাবার আগেই পুলিশকে তার কর্মস্থলে ফিরে পেতে চেয়েছে। সর্বসাধারনের আশার কেন্দ্রে থাকা এই পুলিশ কি কারণে প্রত্যাশিত সেবা দিতে পারছে না? একই কথা অন্যভাবে বলি। সেবা দানের প্রেক্ষাপটে এতো আলোচনায় থাকা বাংলাদেশ পুলিশের প্রকৃত *“pain points”* বা কষ্টের জায়গাগুলো কী – স্ট্র্যাটেজিক পর্যায় থেকে এ সমস্যাটি নিয়ে আমরা কতোটা ভেবেছি, বা ভাবছি?

নব্বই দশকের মাঝামাঝি পুরোনো ঢাকায় একটি ডাকাতি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমেরিকান প্রবাসী আমার এক শ্যালিকা সম্পর্কীয়া আত্মীয়া ক্ষুব্ধভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন,’আমাদের এলএ-তে (তিনি লস এঞ্জেলসের বাসিন্দা) হলে হেলিকপ্টার দিয়ে পুলিশ ডাকাতদের তাড়া করতো। আমি তখন চাকুরিতে নতুন। তবুও বললাম, ‘আমাদের এখানে ছোট্ট একটা সমস্যা আছে। হাজারিবাগ থানায়তো নয়ই; এমনকি ডিএমপি বা বাংলাদেশ পুলিশেরও একটি হেলিকপ্টার নেই। পাঠকের উদ্দেশ্যে বলি, একদল ডাকাতকে আকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ করে তাড়া করার জন্য দু’ কোটিরও বেশি বাসিন্দার সেবা দানে নিয়োজিত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের এখনও কোন হেলিকপ্টার নেই! থাক, আরও ছোট বিষয় নিয়ে কথা বলি। ঢাকার পার্শ্ববর্তী একটি জেলায় চলতি বছর কোন একটি মাসের চিত্র হলো, জেলায় ৯ শতাধিক মোবাইল ‘হারানো’ ও ৯০-এরও কাছাকাছি মানুষ নিখোঁজ সংবাদ-এর জিডি হয়েছে। সেবা প্রত্যাশী জিডি করেছেন, কিন্তু সেবা দাতা পুলিশের তদন্ত বা অনুসন্ধানী কর্মকর্তার কি লাগবে? সিডিআর ও গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, নিদেনপক্ষে প্রাথমিক জ্ঞান; এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংগ্রহের আনুষ্ঠানিক সুবিধা; নিজে সিডিআর ও গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষক না হয়ে থাকলে অনুরূপ কোন বিশেষজ্ঞ সহায়তা নেয়ার অনানুষ্ঠানিক নয়, আনুষ্ঠানিক সুবিধা। তালিকাটা আবশ্যকীয়ভাবে আর একটু বড়ো করে বলি, যথাযথ ছক মোতাবেক তদন্ত বা অনুসন্ধান হচ্ছে তা’ নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন তদারককারী কর্মকর্তা; এবং ... ... টেকনিক্যাল তালিকাটা আরও একটু দীর্ঘ; আপাতত সেটা না বাড়ালাম।

তো, আপনি মান সম্মত সেবা না পেয়ে ক্ষুব্ধ হতেই পারেন। কিন্তু সেবাদানকারীর সমস্যাটি হলো, তারতো ‘হেলিকপ্টারই’ নেই!

এর সাথে আগস্ট ’২৪-পরবর্তী পুলিশ সদস্যদের সমস্যা বাস্তব কারণেই আরও একটু প্রকট। মাঠ ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের নেতৃত্বে থাকা একটি বড়ো অংশ রাজনৈতিক কারণে ১৫ বছর যাবত বঞ্চিত, তাই ক্ষুব্ধ; আর দুর্ভাগ্যবশত

সেই একই কারণে মাঠ ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে তাদের অনেকেরই কিছুটা অনভিজ্ঞতা ও অদক্ষতাও রয়ে গেছে, তা' স্বীকার করতেই হয়। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ছাড়া শুধু আইন আর আলোচনা দিয়ে এ গ্যাপ পূরণ করা সম্ভব নয়!

আগস্ট-উত্তর বিপ্লবী সরকার পুলিশের সংস্কারের জন্য কমিশন করেছে। অনেক ভালো ও থটফুল সাজেশন এসেছে। পুরনো আইন সংস্কারের কথা এসেছে। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি ও ১৯৪৩ সালের পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গাল আধুনিকায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। একটি স্বাধীন পুলিশ জবাবদিহিতা কমিশনের কথা বলা হয়েছে। গ্রেপ্তার ও আটক প্রক্রিয়ার সংস্কারের কথা বলা হয়েহে। একটি স্বাধীন সংস্থা গঠন করে পুলিশ সদস্যদের পেশাগত দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও নাগরিক অভিযোগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রস্তাব রয়েছে। সাক্ষী ও ভিকটিমদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি পৃথক আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। রাজনীতিমুক্ত, মেধাভিত্তিক ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যবস্থার প্রবর্তন, শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা মূল্যায়ন,পুলিশ সদস্যদের আবাসন, চিকিৎসা, মানসিক সাপোর্ট, ছুটি ও কাজের সময় নির্ধারণে উন্নত নীতিমালা প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন, ডিজিটাল পুলিশিং,তথ্যভিত্তিক গোয়েন্দা বিশ্লেষণ, সাইবার ও আন্তঃদেশীয় অপরাধ দমনের জন্য সাইবার, আর্থিক ও আন্তঃদেশীয় অপরাধ মোকাবিলায় বিশেষায়িত ইউনিট ও আঞ্চলিক সমন্বয় কাঠামো গঠনের কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি থানায় নাগরিক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে "কমিউনিটি সেফটি বোর্ড" গঠনের কথা বলা হয়েছে। পুলিশে অন্তত ২৫% নারী সদস্য নিয়োগ ও তাদের জন্য নিরাপদ অবকাঠামো ও ক্যারিয়ার উন্নয়ন সুবিধা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। উপযুক্ত পারফরম্যান্স সূচক নির্ধারণসহ পুলিশের তদারকি, মূল্যায়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ সংস্কার কাঠামোর লক্ষ্য **একটি জবাবদিহিমূলক, মানবিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও নাগরিক-বান্ধব পুলিশ বাহিনী** গঠন। এটি শুধুমাত্র আইন বা কাঠামোর পরিবর্তন নয় - বরং সংস্কৃতিগত রূপান্তর, যেখানে সেবা, সততা ও জনগণের আস্থা হবে পুলিশ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু।

এ চমৎকার আইডিয়া ও পরামর্শগুলো অবশ্যই আল্লাহ চাহেতো বাস্তবায়ন হবে; নেহায়েত পুলিশের নয়, দেশ ও জনগণেরই স্বার্থে। তবে আমি আজ ঠিক এ সব বিষয় নিয়ে কথা বলব না। আমি কথা বলব, সামান্য একটু উদ্যোগ নিয়েই আমরা কিভাবে সেবা ও দক্ষতার গুণগত মানে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারি, সে রকম কিছু বিষয় নিয়ে।

প্রথমে তদন্ত নিয়ে বলি। তদন্ত মানে যদি হয় সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করা, তাহলে আমাদের তদন্তকারী কর্মকর্তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্তের প্রেক্ষাপটে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহে সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়ে গেছে (যারা খুব ভদ্র ভাষায় করা অভিযোগ বুঝতে পারেন না, তারা পড়ুন, 'তদন্তকারী কর্মকর্তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্তে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জ্ঞান ও দক্ষতা নেই')। একুশ শতাব্দীর উপযোগী তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে তৈরি রাখতে হলে, তাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, তদন্ত মানে কতকগুলো ১৬১ ও কয়েকটি ১৬৪-এর বান্ডিলমাত্র নয়!

'তদন্ত' মানে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ আর সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য অপরাধস্থল গুরুত্বপূর্ন উৎস। বলা হয় প্রত্যেক আসামী অপরাধস্থলে তার অপরাধের বিষয়ে কিছু প্রমাণ রেখে যায়। কিন্তু, অপরাধস্থল থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহে তদন্তকারী কর্মকর্তার পেশাগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে তার দক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এখন সিআইডি কিংবা পিবিআই-এর ক্রাইম সিন টিমের সহায়তা নেওয়ার সুযোগ আছে। তবুও তদন্তকারী কর্মকর্তাকে জানতে হয়, ঘটনাস্থল থেকে কি প্রক্রিয়ায়, কি ধরনের বস্তুগত বা ডিজিটাল আলামত তিনি সংগ্রহ করবেন বা করাবেন; কিংবা তিনি কি করলে বা না করলে অপরাধস্থলে সম্ভাব্য বস্তুগত সাক্ষ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সাক্ষী বা আসামীর সাক্ষাৎকার বা জিজ্ঞাসাবাদ তদন্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও আমাদের অধিকাংশ তদন্তকারী কর্মকর্তার জন্যই এ বিষয়ে একাডেমিক এবং/কিংবা পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধির বা প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আসামীকে গ্রেপ্তার, তার দেহ, বাসস্থান কিংবা যানবাহন তল্লাশী করে অপরাধের তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার দক্ষতা বা প্রশিক্ষণ অনেক পুলিশ অফিসারেরই পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

তদন্তে সন্দিগ্ধ আসামীর PCPR তথা পূর্ববর্তী অপরাধ ও সাজা সংক্রান্ত সূত্র যাচাই করতে হয়। এখন ভিলেজ ক্রাইম নোট বুক বা VCNB নেই, মানে ভিসিএসবি রক্ষণাবেক্ষণের চর্চা নেই; আছে ডিজিটাল ভিসিএনবি তথা ক্রাইম

ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা CDMS ডেটাবেজ। এটা ভাল যে, কিছু ব্যতিক্রম বাদে উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক তদন্তকারী ও তদারককারী কর্মকর্তা এখন CDMS ব্যবহার করতে জানেন। CDMS-এর অধিকতর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় থানার ভিসিএনবি, কোর্টের পরওয়ানা, দৈনন্দিন বিচারাধীন মামলার তালিকা, বিচার মামলার নথি, চূড়ান্ত স্মারক, সাজা পরওয়ানা, বেইল বন্ড রেজিস্টার প্রভৃতি সংযোজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। CDMS-এ একজন ব্যক্তির রেকর্ড কেবল একবার থাকবে। এ অনন্যতা রক্ষণাবেক্ষণে যত্নশীল হলে সিডিএমএস ব্যবস্থাপনায় একটি বড়ো অগ্রগতি নিশ্চিত করা যাবে।

আসামী গ্রেপ্তার, ভিকটিম বা মালামাল উদ্ধার, সহযোগী আসামীকে চিহ্নিতকরণ প্রভৃতি নানা কাজে সিডিআর, ব্যাংক একাউন্ট তথ্য, ফেসবুক, ই-মেইল প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণকরণ এখন তদন্তের গুরুত্বপূর্ন অংশ বলে চিহ্নিত হয়। সব তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অপরাধে গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষক না হলেও চলে, তবে সব তদন্তকারী কর্মকর্তার জন্য প্রতিটি জেলা বা ইউনিটে একটি অপরাধ গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ সেল থাকা ও এরূপ গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ সেল সহায়তা গ্রহণের জন্য সব তদন্তকারী কর্মকর্তারই এ বিষয়ে প্রাথমিক সচেতনতা বা জ্ঞান থাকাটা অত্যন্ত জরুরী। উল্লেখ্য, পুলিশ আদেশ ১/২০২৪-এ প্রতিটি জেলা বা ইউনিটে একটি অপরাধ গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ সেল থাকা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বিকাশ, নগদ, রকেট, ইউক্যাশ প্রভৃতি মোবাইল ফাইন্যান্সের মাধ্যমে এখন বিভিন্ন রকম অপরাধ হচ্ছে। যদিও এসব মাধ্যমে অর্থ লেনদেন বিশ্লেষণের উপর তদন্তকারী কর্মকর্তাদের খুব অল্প সংখ্যকেরই পেশাগত জ্ঞান রয়েছে। আবার ইন্টারনেটের মাধ্যমেও অপরাধ হচ্ছে। তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তার জন্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, ওয়েবসাইট থেকে বা ডিজিটাল ডিভাইস থেকে তিনি কিভাবে কি ধরণের সাক্ষ্য প্রমাণ বা তথ্য সংগ্রহ করবেন, যা কিনা একইসাথে আদালত- গ্রাহ্যও হবে।

জটিল মামলাসমূহের তদন্তে বা অপরাধসংক্রান্ত তথ্য উদঘাটনে সিডিআর বা কলরেকর্ড বিশ্লেষণ একটি অন্যতম কার্যকর 'টুল' হিসেবে বিবেচিত হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান না থাকলে মামলার তদন্তে সিডিআর থেকে প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য 'আউটপুট' তৈরি নাও হতে পারে। কোন দক্ষ নিয়মিত এনালিষ্ট দ্বারা বিশ্লেষিত হলে একই সিডিআর থেকে প্রয়োজনীয়/ অধিকতর তথ্য বা তথ্যসূত্র পাওয়া যায়, যা থেকে অপরাধ বা অপরাধীর রহস্য-উন্মোচনের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

আমরা হয়তো ৩০,০০০ (বাংলাদেশ পুলিশের এসআই থেকে তদূর্দ্ধ বিদ্যমান জনবল) তদন্ত বা তদারককারী পুলিশ কর্মকর্তাকে সিডিআর এনালিষ্ট বা ক্রিমিনাল ইন্টিলিজেন্স এনালিস্ট বানাতে পারব না; কিন্তু পুলিশ আদেশ ১/২০২৪ অনুসরণ করে প্রতি জেলা বা ইউনিটে একটি ছোট্ট জনবলকে প্রশিক্ষিত করে ক্রিমিনাল ইন্টিলিজেন্স এনালাইসিস সেলের মাধ্যমে তদন্তকারী কর্মকর্তাদের তদন্তে সহায়তার জন্য নিযুক্ত করতে পারি। আনুষ্ঠানিকভাবে 'ক্রিমিনাল ইন্টিলিজেন্স এনালাইসিস সেল' প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত এ সহায়তার ক্ষেত্রটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে থাকেনা; বরং অপরাধ গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ অনেকটাই ব্যক্তি বা কর্মকর্তাবিশেষ নির্ভর রয়ে যায়। সহায়তার ক্ষেত্রটি প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোতে এনে আমরা প্রায় ১০০% মামলার তদন্তের ফলাফলে বিষ্ময়কর ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারি।

কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে জেলার ক্রিমিনাল ইন্টিলিজেন্স এনালাইসিস সেলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা যায়। নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও এলাকায় এক অজ্ঞাতনামা কিশোরীর লাশ পাওয়া গেল। ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স এনলাইসিসে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জেলা পুলিশের কর্মকর্তা ক্রাইমসিনকে ঘিরে কয়েকশ’ মিটার এলাকা সার্চ করতে বললেন। ঘটনার একদিন পরে ঘটনাস্থল থেকে ১০০ মিটার দূরে সিমবিহীন মোবাইল ফোন খুঁজে পেয়ে জব্দ করা হল। এ মোবাইল ফোনের সিডিআর বিশ্লেষণ করে ভিকটিমের পরিবার ও তার পরিচয়কে সনাক্ত করা হয়।

আবার ধরা যাক, বিকাশের এজেন্ট খাইরুলের কাছে জনৈক কাস্টমার বশির উদ্দিন ৫০,০০০ টাকা ক্যাশ-আউট করে চলে গেলেন। এজেন্ট খাইরুল একটু পর দেখতে পান, তার এজেন্ট হিসাবের মোবাইল সিম কাজ করছে না। কয়েক ঘন্টা পর নতুন সিম তুলে তিনি দেখেন, তার এজেন্ট হিসাবের ৩ লক্ষ টাকার পুরোটাই চুরি হয়ে গেছে। এখানে চোর কে, চোর চক্র কি কৌশলে ৩ লক্ষ টাকা চুরি করলো আর চুরির সাথে কাস্টমার বশির উদ্দিন বা তার

৫০,০০০ টাকার কি সম্পর্ক আছে, এসব বের করার জন্য জেলা পর্যায়ে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্রিমিনাল এনালিস্ট বা তার দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সিআইডি'র ফরেনসিক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (এফটিআই) ২০১৩ সাল থেকে 'ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স এনালাইসিস কোর্স (সিআইএসি)' পরিচালনা করে আসছে। এই কোর্স, যা 'সিডিআর এনালাইসিস কোর্স' নামেও পরিচিত, বাংলাদেশে পুলিশ অফিসারদের মধ্যে লক্ষ্যনীয় জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এ যাবত ১০০০-এরও বেশি অতিঃ এসপি, এএসপি ও অন্যান্য কর্মকর্তাকে ক্রিমিনাল ইন্টিলিজেন্স এনালাইসিসের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যাই হোক, ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স চালিত বাংলাদেশ পুলিশের সাফল্যকে দেখতে হলে প্রতিটি জেলা বা ইউনিটে প্রাথমিকভাবে ৩০-১০০ জনবলের একটি ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স এনালাইসিস ইউনিট থাকতে হবে, যার সদস্যরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়ে মাঠ পর্যায়ে প্রতিনিয়ত তদন্তকারী কর্মকর্তাদের তদন্তে সহায়তা করবেন। পুলিশ আদেশ ১/২০২৪-এর মাধ্যমে প্রতিটি জেলা বা ইউনিটে প্রাথমিকভাবে একটি ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স এনালাইসিস ইউনিটের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা' এখনও বাস্তবায়ন হয়নি।

অবশ্য ক্রিমিনাল-ইন্টেলিজেন্স-চালিত পুলিশিং-এর সাফল্যের জন্য এ ক্রিমিনাল-ইন্টেলিজেন্স এনালাইসিস ইউনিট বা সি.আই.এ.ইউ. যাদের প্রত্যক্ষ সেবা দিবে - মাঠ পর্যায়ের তদন্তকারী বা তদারককারী কর্মকর্তা, তাদেরও কিন্তু ক্রিমিনাল-ইন্টেলিজেন্স বিষয়ে ওয়ার্কিং নলেজ থাকতে হবে। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? বাংলাদেশ পুলিশের এসআই থেকে অতিঃ এসপি পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার কর্মকর্তাকেই দ্রুততম সময়ে বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্তের ওয়ার্কিং নলেজ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্তের সংজ্ঞাটি কি হবে? মৌখিক সাক্ষ্য নির্ভর তদন্ত বাদ দিয়ে বস্তগত সাক্ষ্য-নির্ভর তদন্ত? না। না, এই অর্থে যে, এমনকি সাক্ষী বা আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ কৌশলেও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। সোয়া দু' লক্ষ পুলিশ বাহিনীর ৩০ সহস্রাধিক এসআই ও তদুর্ধ কর্মকর্তার মধ্যে অনেক কর্মকর্তাকেই জিজ্ঞাসাবাদ কৌশলের উপর প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজনীয়ত রয়ে গেছে;যদিও আমাদের প্রথাগত পুলিশী তদন্তে কার্যবিধি ১৬১ ধারায় সাক্ষী বা আসামীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধকরণ নির্ভরতাই বেশি ।

সিডিআর বিশ্লেষণ, সেলআইডি ট্র্যাকিং, অপ্রদর্শিত বা কালো টাকা বিশ্লেষণপূর্বক মানি লন্ডারিং আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ, মোবাইল ফাইন্যান্স সংশ্লিষ্ট অপরাধের তদন্ত, ক্রাইম ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা সিডিএমএস-এর ব্যবহার, ক্রাইম সিন ম্যানেজমেন্ট, আইটি ফরেনসিক ও সাইবার ক্রাইম, ডিএনএ আলামত সংগ্রহ কৌশল, ভিজুয়াল এনালাইটিক্যাল চার্টের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ অপরাধের তদন্ত , কিংবা নারী, শিশু, ভিকটিম ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, ৩০টিরও বেশি বিষয় নিয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে, তবে কোন একটি বিষয়ে বছরে ১ বা ২ হাজারের বেশি পুলিশকে প্রশিক্ষণ দিতে পারছি না। যাই হোক, বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্তে কেবল একটি বিষয়ে আমরা বছরে ১ হাজার পুলিশকে প্রশিক্ষণ দিতে পারলেও কেবল এসআই থেকে তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার ৩০ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দিতে আমাদের লাগবে ৩০ বছর! (অতএব ৩০টি বিষয়ে লাগবে ৩০×৩০ বছর)।

এই বাস্তবতায় আমাদের দু'টো পছন্দ রয়েছে।

> এক, আমরা প্রতিটি জেলা থেকে ১ বা ২ জন করে অতিঃ এসপি/এএসপি ও ২/৩ জন পরিদর্শক ও এসআই-কে নিয়ে প্রায় ৩০০ কর্মকর্তাকে ToT বা প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স করিয়ে তাদের দিয়ে নিজ নিজ জেলা বা ইউনিটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করতে পারি।
>
> দুই, tutelagebd.com-এর মাধ্যমে একই সাথে বহু সংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্তের জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে পারি।

আমরা মিশ্র বা হাইব্রিড পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারি। প্রশিক্ষণার্থী যে বিষয়ে অন-ক্যাম্পাস ক্লাস করবে, তাকে আগেই সে বিষয়ে অনলাইনে স্টাডি করার সুযোগ দেয়া। এমন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকের মধ্যে ইন্টারেকশন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়ে গুণগত মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা যাবে।

এখানে জেলা বা রেঞ্জ পর্যায়ের (এসপি, ডিআইজি) কর্মকর্তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, উপযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ করিয়ে নিয়ে তাদের দিয়ে নিজ নিজ জেলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা; এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছ থেকে মান-উন্নীত সেবা আদায় নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ তদারকি করা।

মাঠ পর্যায়ে বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্তে সক্ষম কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গাইড করা কিংবা তাদের পরিশ্রমলব্ধ তদন্তকে সমর্থন বা উৎসাহ যোগানো, কিংবা নীতিগত বা বস্তুগত সমর্থন দেওয়ার মতো সচেতনতা ও দায়বোধ নিয়ে মধ্য বা উর্ধ্ব-পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ আছেন, এমন বাস্তবতা তৈরি করতে পারলে বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্তে পুলিশের সামগ্রিক আউটপুট লক্ষ্যনীয় পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, যে সব বিষয় নিয়ে কথা বলেছি, এদের অধিকাংশই পুলিশের অভ্যন্তরীন উদ্যোগের মাধ্যমেই প্রাথমিকভাবে চালু করা সম্ভব।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনাগুলো নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করে। কিন্তু বাস্তবে পরিবর্তন আসবে তখনই, যখন বাহিনীর ভেতর থেকেই **চিন্তা, দক্ষতা ও সংস্কৃতির** পরিবর্তন শুরু হবে। আমরা যদি প্রতিটি জেলায় বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্ত, তথ্য–নির্ভর বিশ্লেষণ, এবং টেকসই প্রশিক্ষণ–সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারি—তাহলে আইন সংশোধন বা বড় কমিশনের অপেক্ষা না করেও পুলিশের সেবার মানে বিপুল ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। পুলিশের প্রকৃত সংস্কার মানে শুধু আইন বা আলোচনা নয় - **মানুষ, মনোভাব ও মেধার সংস্কার**। যেদিন মাঠপর্যায়ের প্রতিটি তদন্তকারী কর্মকর্তা সত্যিকারের *ইন্টেলিজেন্স–লেড প্রোঅ্যাকটিভ পুলিশিং*–এর স্বাদ বুঝে কাজে লাগাতে পারবেন, সেদিনই বাংলাদেশ পুলিশ পুনরায় জনগণের আস্থার জায়গায় ফিরে যাবে—সংস্কারের ভেতর থেকেই শুরু হবে সেই পুনর্জাগরণ।

https://bangla.surakkhabd.com/%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%be-%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%9f%e0%a7%87-%e0%a6%aa/